Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 127–133
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

বিশ্বায়ন ও লেটোগান

অঙ্কিতা রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: ankita94roy@gmail.com

Keyword
বিশ্বায়ন, লেটোগান, সংস্কৃতি, লৌকিক, গণমাধ্যম, সামাজিক, শিল্পী

Abstract
বিশ্বায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিকভাবে একটি একক বিশ্ব সমাজ প্রতিষ্ঠার অবদান রেখেছে। অর্থাৎ বিশ্বায়ন হল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকগত ভাবে মানুষকে সংযুক্ত করার একটি প্রক্রিয়া। বিগত কয়েক বছরের মধ্যে অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, গণমাধ্যম প্রভৃতি জায়গায় একটা বিরাট অংশে আলোচনার বিষয় বিশ্বায়ন, যার সম্পর্কে দুই দশক আগে মানুষের মধ্যে কোনো ধারণায় ছিল না। কিন্তু বিশ্বায়ন শব্দটি একুশ শতকের শুরুতে আন্তর্জাতিক ও বিশ্ব মানবিক আদর্শ রূপে সারা পৃথিবীতে প্রচারিত হয়েছে। তবে এটি কেবল আর্থিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, তা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের পথকেও প্রশস্থ করেছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিশ্বায়নের ধারক ও বাহক হিসাবে কাজ করে চলেছে মানুষ। একটি সমাজকে বাদ দিয়ে কোনো সংস্কৃতিই গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। সমাজ ও সংস্কৃতি পরস্পর ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। পারিপার্শ্বিক কোনো ঘটনা যদি জনসমাজে প্রভাব ফেলে তার ফলস্বরূপ সেই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি প্রভাবিত হয়। বিগত কয়েক দশক ধরে যে পরিবর্তনগুলি প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে তার উল্লেখযোগ্য কারণ বিশ্বায়ন। যার প্রভাব পড়েছে বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির উপর। রাঢ় অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় গ্রাম্য সংস্কৃতি হলো লোকনাট্য লেটো। একুশ শতকে এসে লেটোগান ও লেটোপালা এখন বিশ্বায়নের করালগ্রাসে। লেটোগানের বিষয়বস্তুতে যে গ্রাম্য সুর নির্মল অনুভূতির প্রকাশ ছিল বিশ্বায়নের প্রভাবে তার ভাষা ও বিষয়বস্তু কলুষিত হচ্ছে। আধুনিকতার সংস্পর্শে বাণিজ্যিক কারণে এসব করা হচ্ছে। এর আঙ্গিক একটা অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু প্রাথমিকভাবে বিশ্বায়ন কোনো অঞ্চলের গন্ডি মানে না, তাই সেই গান এখন আঞ্চলিক সীমা অতিক্রম করে বিচিত্র সংগীত হিসাবে ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন অঞ্চলে। অত্যাধুনিক উন্নত কারিগরি ব্যবস্থায় লেটোগানে ব্যবহৃত সমস্ত আনুষঙ্গিক যন্ত্রগুলি বর্জন করা হচ্ছে। তার জায়গায় এসে পড়েছে ইলেকট্রনিক যন্ত্র। তাছাড়াও লেটোগানে ও পালায় শিল্পীদের ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ, মঞ্চসজ্জা, আলোক সব কিছুই পরিবর্তিত। বিশ্বায়নের ফলে মানুষের মধ্যে অতি আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে ফলত লৌকিক গ্রাম্য রুচি বদলে গেছে। লেটোগানের আসরে লৌকিক স্বাদের পরিবর্তে জায়গা করে নিয়েছে পশ্চিমি সংগীত ও গণসংস্কৃতির আধুনিক গান, মানুষ সেগুলিকে অনায়াসেই ভোগ করছে। তবে বিশ্বায়ন একাধারে স্থানীয় সংস্কৃতির উপর প্রভাব ফেললেও অনেকক্ষেত্রে

বৈদ্যুতিক গণমাধ্যমের সাহায্যে স্থানীয় সংস্কৃতি বিশ্বের কাছে পরিচিত হচ্ছে। এর মাধ্যমেই নতুন করে সংস্কৃতি গুলির পুনরুত্থানের চেষ্টা করা হচ্ছে। পরিশেষে বলা যাই, বিশ্বায়নের দ্বারা সমস্যা যেমন তৈরি হচ্ছে, তেমনই এর সমাধানও সম্ভব। সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে বিশ্বায়নকে সমস্যা তৈরির সহায়ক হিসাবে না ভেবে সমাধানের সহায়ক বলে আমরা স্বাগত জানাব।

Discussion

ইংরেজি 'গ্লোবালাইজেশন' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হল 'বিশ্বায়ন'। সহজভাবে বললে এর অর্থ বিশ্বব্যাপী। প্রযুক্তির বিস্তার, বাণিজ্যিক বিস্তার, দেশের ও বিশ্বের মধ্যে কোনো বেড়াজাল না থাকা। বিশ্বায়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার সঙ্গে জড়িত থাকে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক মুক্ত পরিবেশ এবং বিশ্ব অর্থনীতির অঙ্গীভূত দেশগুলির গভীর অর্থনৈতিক সমন্বয়। ১৯৭০ এর দশক থেকে বিশ্বের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে যে বহুমাত্রিক পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলিকে একত্রে বিশ্বায়ন বলা যেতে পারে। বিশ্বায়ন ধারণাটির কেন্দ্রীয় বিষয় হল এক ও অবিভক্ত বিশ্ব গঠন। ফলে পৃথিবীব্যাপী জনগোষ্ঠী সমূহের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও প্রভাব প্রতিক্রিয়াই বিশ্বায়ন হিসাবে বিবেচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ও জনগোষ্ঠী সমূহের মধ্যে এক নিবিড় একাত্মতার ও ঘনিষ্ঠতার সংহতি। বিশ্বায়নের পরিবহন, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার ভীতি ও মুনাফা অর্জনের প্রলোভনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে পুঁজি, প্রযুক্তি, পণ্য পরিষেবা, তথ্যাদি ও জনসাধারণের চলাচলের ক্ষেত্রে জাতি রাষ্ট্র সমূহের সীমা লঙ্ঘন যেমন আছে, ঠিক তেমনি অর্থনৈতিক কার্যকলাপের একটি সংগঠনও আছে। এটি একটি একক বিশ্বব্যবস্থার সংগঠন যার দ্বারা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলিতে বৈচিত্র্যের বিলোপসাধন ঘটে। বিশ্বায়ন হল এমন একটি মাধ্যম যা পুঁজিবাদের আর্থসামাজিক বিকাশের প্রতিনিধিত্ব করে। এককথায় সমগ্র বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একক বিশ্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠা এবং নিবিড় সংযোগ সাধনের একটি প্রক্রিয়া। সামগ্রিক বিচারে বিশ্বায়নের ধারণা মূলত অর্থনৈতিক। যার প্রধান লক্ষ্য ছিল সমগ্র বিশ্ব জুড়ে সমজাতীয় বিশ্ব অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাষ্ট্রগুলির আইনের প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে আন্তর্জাতিক প্রসার ঘটলো। একইসঙ্গে মূলধন ও প্রযুক্তির জোগান দিয়ে নতুন শিল্পজাত পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি করল। ফলত আর্থিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকার পরিবর্তে পশ্চিমের বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি ও তাদের মুখ্য পৃষ্ঠপোষক সংস্থা যথা আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার, বিশ্বব্যাংক, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পুঁজির জোগান নেওয়ার ফলে তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল অনুন্নত রাষ্ট্রগুলি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির নীতি নির্ধারণে তাদের স্বার্থের বাহক হিসাবে কাজ করছে। এর ফলস্বরূপ আর্থিক বিশ্বায়ন প্রকাশিত হচ্ছে। বিশ্বায়ন জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা বাতিল করে রাষ্ট্রকে বাজারকেন্দ্রিক সংস্থায় পরিণত করতে চায়। রাজনৈতিক বিশ্বায়ন হল উন্নয়নশীল দেশগুলির বাজার দখল করা। এর মূল পরিচালক হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আর তার সহযোগী হল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স। এই রাষ্ট্রগুলি সাধারণভাবে জাতি-রাষ্ট্রের সীমাকে অতিক্রান্ত করে নানা উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর বহুজাতিক কোম্পানি দ্বারা তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে চাইছে ফলে রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব বিপন্ন ও সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে। তাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে অতীতের মতো তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির উপর নতুনভাবে ও নতুনরূপে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। বিশ্বায়ন উন্নত তথ্য প্রযুক্তির দ্বারা বিশ্বের সংস্কৃতির জগতে বিশাল প্রভাব ফেলেছে। অন্যদিকে বিজ্ঞানের উন্নতিকে কাজে লাগিয়ে বিদেশি জিনিসকে নতুন আচ্ছাদনে হাজির করছে। ফলে ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারা আজ কোথাও সীমাবদ্ধ নেই, সর্বত্রই বিরাজমান এই বিজাতীয় সংস্কৃতি। আবার মানুষ ইন্টারনেট ও টিভির সাহায্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভিন্ন সংস্কৃতিগুলি ঘরে বসে অল্প ব্যয়ে অল্প পরিশ্রমে আয়ত্ব করছে এবং বিজাতীয় ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটছে। সমাজ যুবসম্প্রদায়ের বেশভূষারও পরিবর্তন হয়েছে, পরনে জিন্স, প্যান্ট, হাতে ঘড়ি, স্মার্টফোন, মুখে ফাস্টফুড। টিভির মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিসের বিজ্ঞাপনে আজ বাজার পরিপূর্ণ। এইভাবেই ভোগবাদী সংস্কৃতি উন্নয়নশীল দেশগুলির নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে, বিশ্বায়িত সংস্কৃতির সঙ্গে আঞ্চলিক

সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটছে এবং জন্ম নিচ্ছে এক নতুন ধরনের সংস্কৃতি। অর্থাৎ বিশ্বায়ন এমন একটি ধারণা যা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতে চরম প্রভাব ফেলেছে। আবার বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটি একক বিশ্ব সমাজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিগত কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বায়নের চর্চা আজ সর্বত্রই কিন্তু দুই দশক আগে মানুষের মধ্যে এর সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। বলা যেতেই পারে বিশ্বায়ন আজ একুশ শতকে মানবিক হয়ে মানুষের মণিকোঠায় জায়গা করে নিয়েছে, তার রুচি, চাহিদাকে বদলে দিতে সক্ষম হয়েছে মানুষ।শুধু তাই নয় তা এখন আন্তর্জাতিক ও বিশ্ব মানবিক আদর্শ রূপে সারা পৃথিবীতে প্রচারিত হচ্ছে। মানুষ বিশ্বায়নকে মনে প্রানে এতটাই গ্রহণ করছে যে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে লজ্জার সম্মুখীন হচ্ছে, যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে না পারলে তাকে এই বিশ্বায়নের দুনিয়ায় অনেকটাই পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে।তবে এটির ধারণা কেবল অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে শুরু হলেও তা আজ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের পথকেও প্রশস্থ করেছে। একটি সমাজকে বাদ দিয়ে কোনোভাবেই কোনো সংস্কৃতি গড়ে ওঠে না এবং সমাজের লোক-ই সেই সংস্কৃতিগুলির ধাত্রী। সংস্কৃতি একটি জাতির পরিচয়ের বাহক হিসাবে কাজ করে। আবার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিশ্বায়নের ধারক ও বাহক হিসাবে কাজ করে চলেছে মানুষ।সমাজ ও সংস্কৃতি একে অপরের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজে মানুষ একে অপরের সহযোগিতায় একত্রে বসবাস করে এবং সেখানে একটা অঞ্চলের মধ্যে তাদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা প্রভৃতি সবকিছুকে নিয়েই একটি সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে যা লোকসংস্কৃতি নামেই পরিচিত। তাই সেই সমাজের মধ্যে পারিপার্শ্বিক যদি কোনো ঘটনা ঘটে তার প্রভাব যেমন জনসমাজে পড়ে তেমনি সেই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিতেও প্রভাব ফেলে, সেই অবস্থার জন্য প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বায়ন। যার থাবা কিন্তু গ্রাম বাংলার স্নিগ্ধ সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য –

> *"বিশ্বায়নের আদর্শগত ক্রিয়াকলাপ বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির বলয়ে এমন এক অসহায়ত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে চায়, যাতে প্রত্যেকেরই মনে হবে, বিশ্বায়নের বিকল্প বুঝি সত্যিই কিছু নেই, বিশ্বায়নের আগ্রাসনের সামনে বড় বড় জাতি ও দেশগুলিও অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে।"*[১]

বিগত একশো বছরে জনসমাজে এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে। একশো বছর আগে মানুষের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম ছিল গোরুর গাড়ি কিন্তু এখন দ্রুতগামী বিমানেও তার মন ভরে না। আগে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল চিঠিপত্র এখন তা প্রাচীন ধারার সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। এখন যাতায়াত, যোগাযোগ, বিনোদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে মনোরঞ্জনের এক নতুন ভাবনা জন্ম নিয়েছে মানুষের মনে। এ অস্বাভাবিক ঘটনা কিছু নয় তা কালের নিয়মে বিশ্বায়নের ফাঁদে সমাজের এই অবস্থা। এই সব সংস্কৃতির পাশাপাশি বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির উপরও প্রভাব পড়েছে। আদিম যুগে মানবজাতি খাবারের জন্য পশু শিকার করত, এমনকি পাথরের সাহায্যে আগুন জ্বালাত, পরে তারা নিজেরাই পশুপালন করতে শিখলো, গুহার গায়ে নানা ছবি আঁকতে শিখলো। এখান থেকেই তাদের মধ্যে জন্ম নিল নানা ধরণের অনুভূতি, আবেগ, বিশ্বাস, ধারণা যা লোকসংস্কৃতির ইঙ্গিত বহন করে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়-

> *"প্রকৃতি ও পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে তাদের ধারণা, তাদের অনুভূতি ও বিশ্বাসের অভিব্যক্তি ঘটত নানা আচার-অনুষ্ঠান-নৃত্য-গীত-দেওয়াল চিত্রের মাধ্যমে। এসবই লোকসংস্কৃতির আদিম অবস্থার নাচ-গান-ছবির উদাহরণ।"*[২]

এই আনন্দের মধ্যে দিয়ে একদিন তারা কৃষিকাজ করে ফসল ফলাতে শুরু করল এই কৃষিভিত্তিক জীবনকে কেন্দ্র করে তারা নানান ধরণের নাচ গানের পাশাপাশি কামনা করত কৃষিক্ষেত্র ফসলে ভরে উঠুক, নারী সন্তান সম্ভবা হোক এবং তাদের বিশ্বাস ছিল কৃষিকাজের মধ্যে দিয়ে পরিশ্রমের দ্বারা তাদের সমৃদ্ধি অনিবার্য। এইভাবে একটা যুগের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হল লোকসংস্কৃতি। কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতার পাশাপাশি মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রধান ও প্রথম উপাদান যথা খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান প্রভৃতিকে একত্র করে চলতে শুরু করলো এবং তাদের বিভিন্ন চাহিদার সঙ্গে বিকশিত হল লোকসংস্কৃতি। কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য মানুষের মধ্যে সংস্কৃতি মজ্জায় মজ্জায় বিরাজমান।তাদের পরিশ্রমের কৃষিকাজে কোনো শোষকশ্রেণি না থাকায় লোকসংস্কৃতি বেঁচে ছিল খেটে খাওয়া মানুষদের নিজস্ব সংস্কৃতি হয়ে। তারা একে অপরের সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়তো। কিন্তু শোষকশ্রেণি নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে এই লোকসংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে দরবারী সংস্কৃতিকে অঢেল মান্যতা দিয়েছে।যার ফলস্বরূপ বলা যায়-

> *"শোষক শ্রেণির আক্রমণ যখন তীব্রতর হয়েছে লোকসংস্কৃতি তাকে যথাসম্ভব তাকে এড়িয়ে চলতে চেয়েছে। সেই কারণেই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের পাশাপাশি সৃষ্টি হয়েছে লোকধর্ম-লোকাচার, রাজকীয় ক্রীড়ার পাশাপাশি লোকক্রীড়া, জ্ঞান-গর্ভ পুঁথি গ্রন্থের পাশাপাশি লোকপ্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি।"* [৩]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, লোকসংস্কৃতির অস্তিত্বে যুগ পরিবর্তনের ঢেউ আছড়ে পড়েছে। যে আদিম যুগে এই সংস্কৃতির জন্ম, তার ধারণা,প্রকৃতি, মানসিক চিন্তাভাবনা, মূল্যবোধ সবই যেন পাল্টে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত এই পরিবর্তনশীল পরিবেশে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা লোকসংস্কৃতির কাছে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সমস্ত বিপদের একমাত্র কারণ বিশ্বায়নের আগ্রাসন। তার থাবা সারা পৃথিবীকে একটি বাজারে পরিণত করতে চায়। বর্তমানে মানুষের মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধ এর দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আক্রান্ত। লোকসংস্কৃতির স্বাভাবিক ছন্দ আবর্তিত কৃষক সমাজকে কেন্দ্র করে গ্রামীন গরিব মানুষগুলিকে নিয়ে। কিন্তু বর্তমানে পুঁজিবাদি দুনিয়ায় শাষক ও শোষক শ্রেণির সংকটে মানুষেরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন গ্রামীন মেলা, উৎসব-অনুষ্ঠান। যার ফলে লোকশিল্পীদের কদর কমতে থাকছে এবং মানুষেরও সংস্কৃতির প্রতি অনিহা দেখা যাচ্ছে।যেমন এখানে উদাহরণ প্রসঙ্গে বলা যাই, বীরভূমে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা, বসন্ত উৎসব সবই বিগত দুই বছর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। রাঢ় অঞ্চলের লালমাটির এক আকর্ষণীয় সংস্কৃতি এই পৌষমেলা ও বসন্ত উৎসব যা এক মহামানবের মিলনক্ষেত্র বলা যাই, সেটি চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। কিন্তু বর্তমানে পুঁজিবাদি শাসক-শোষক শ্রেণির আগ্রাসন সব কিছু মিলিয়ে এক চিরপুরাতন সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করেছে। পৌষমেলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মানুষের পরিচিতি ঘটত, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত, যার পাশাপাশি দেশ বিদেশের মানুষ গ্রামবাংলার সংস্কৃতিকে উপভোগ করত, বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মিলন ঘটত এক ছত্রছায়ায়। কিন্তু বর্তমানে সারা বিশ্ব মহাসঙ্কটে নিমজ্জিত। ঠিক এরকমই রাঢ় অঞ্চলের একটি অতি জনপ্রিয় গ্রাম্য সংস্কৃতি হল লেটো গান।যুগের এই পরিবর্তন থেকে লেটো গানও মুক্তি পায় নি। বিশ্বায়নের আঁচড় তাকেও স্পর্শ করেছে।তাই সে যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে বদলে ফেলেছে তার চরিত্রকে। লেটোগান রাঢ়বাংলার অতি সুপরিচিত লোকগীতি বা লোকগান যার প্রকাশ এক সময় রাঢ়বাংলার মানুষকে মুগ্ধ করতো লেটোপালার গল্পরস, লঘু হাস্য রসাত্মক গানের মাধ্যমে।কৃষি নির্ভর সমাজের খেটে খাওয়া মানুষগুলি মনোরঞ্জনের প্রধান মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছিল এই লেটো গানকে এবং অবসর সময়ে গ্রাম্য পরিবেশে তারা লেটো গানের চর্চা করতো।কিন্তু যুগের পরিবর্তনে, বাংলার কৃষি ও শিল্পের ভাঙাগড়ার দোলনায় এই গানের গায়ক ও গায়ন রীতির ব্যাপক পরিবর্তনের পথে। লোকগানগুলি আজ আধুনিক শিক্ষা ও জীবন রীতির অনিবার্য টানে বিবর্তিত। লোকসংগীত শুধু নির্মল হৃদয়স্পর্শী সুরের মূর্চ্ছনা মাত্র নয় তার মধ্যে মিশে আছে আঞ্চলিকতার প্রশ্ন। সেই গানের দ্বারা পরিচয় পায় অঞ্চলের সংস্কৃতি, মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা, আচার-আচরণ, যা সেই অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। একুশ শতকে এসে লোকসংগীত গুলিতে অতি আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে, গ্রাম্য আঞ্চলিক সুরের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে অন্যান্য ভাষার গানগুলি। গণমাধ্যমের সাহায্যে মানুষ খুবই আকৃষ্ট হয়ে একত্র সংগীত জগত গড়ে তুলতে চাইছে। এর প্রচার ও প্রসারের দ্রুততার সঙ্গে সঙ্গে লোকসঙ্গীতের মাধুর্য, নির্মলতা বিপন্ন হবে। একুশ শতকে এসে গ্রামবাংলার লোকসংস্কৃতির পাশাপাশি লোকগান গুলিও বিপদের সম্মুখীন। রাঢ় অঞ্চলের এই মাটির গন্ধ মাখা লেটো গানও আজ বিপদের সম্মুখীন। কেননা সেই গানে বা পালাতে একটা গ্রাম্য সুরের দ্যোতনা ছিল। বিশ্বায়নের প্রভাবে তার বিষয়বস্তুতে, আঙ্গিকে,প্রয়োগে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে। যার জন্য দায়ী একমাত্র পুঁজিবাদি দুনিয়া, মানুষের চাহিদা, গণমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া। পূর্বে এই গানের আঙ্গিক একটা অঞ্চলের মধ্যেই সীমিত ছিল কিন্তু বর্তমানে লেটোগান বা পালা রাঢ় অঞ্চল ছাড়িয়ে রাঢ় অঞ্চলের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। লেটোশিল্পীরা তাদের ব্যবসার প্রয়োজনে বায়না নিয়ে অঞ্চল ভেদে ঝাড়খণ্ডের মতো প্রতিবেশী রাজ্যের সীমানায় এই গান বা পালার উপস্থাপনা করছেন।এর কারণ হিসেবে বলা যাই, বর্তমানে আর্থিক চাহিদা, তাদের বায়না নিয়ে গান গাওয়ার এই ব্যবসাকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে তারা বেশি পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে এবং তাদের বায়না পেতে সুবিধা হচ্ছে।

আবার কখনো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে লেটো পালাতে যে গানগুলি গাওয়া হয় বা পরিবেশন করা হয় তা অত্যন্ত মৃদু সুরেলা, মর্মস্পর্শী। কিন্তু বর্তমানে মানুষ এত বেশি টিভি, সিনেমা, সোশ্যাল মিডিয়া ঘেঁষা হয়ে পড়েছে যে

লেটোশিল্পীরা বাধ্য হয়ে সেই গানগুলির সঙ্গে আধুনিক গান, হিন্দি গান, বিভিন্ন চলচ্চিত্রের গান, বাউল গান প্রভৃতির সংমিশ্রণ ঘটাচ্ছে। অর্থাৎ তা একাধারে পাঁচমেশালি সংগীতে পরিণত হয়েছে। সেই গানগুলি পরিবেশনের বা উপস্থাপনের ভঙ্গিতেও পরিবর্তন এসেছে। পূর্ববর্তী লেটো গানের নৃত্যে একটা লৌকিক ছন্দ বিরাজ করতো কিন্তু এখন বিভিন্ন চলচ্চিত্রের অনুকরণে নৃত্যগুলি লেটোগানে পরিবেশন করা হয়। সেখানে শিল্পীদের রীতিমতো লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে মঞ্চ মাতানোর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য-

> *"বিশ্বায়িত ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির অনুষঙ্গে যে ধরণের তান্ডব নৃত্য, যা সহজ ভাষায় বলাই যায় এলোপাথাড়ি, তার কোনো ছন্দ বা কোনো তালের বালাই নেই, তা একেবারেই বেতালা। কিংবা জনপ্রিয়তার তাগিদে তার মাধ্যমে শ্রোতৃমন্ডলীকে উদ্দাম করার একটা প্রচেষ্টা যার মধ্যে সুস্পষ্ট, আমাদের লোকসঙ্গীতের চিরায়ত যে আবেদন, যে আর্তি তা উদ্দামতায় অবর্তমান।"* [৪]

সুতরাং এই মন্তব্যকে লেটো গানের ক্ষেত্রে ধরে নিলে খুব একটা খারাপ হয় না। তার কারণ বর্তমান লেটো গানের পরিবেশনও কিন্তু এক থেকে কোনোভাবেই আলাদা নয়, সেখানেও মঞ্চ কাঁপানো ও এলোপাথাড়ি তান্ডব নৃত্য দেখা যায় যা লোক গানের বা সংস্কৃতির মাধুর্যকে নষ্ট করছে। বর্তমান বিশ্বায়িত রুচিশীল দর্শক এগুলিকেই মাধুর্যের সঙ্গে গ্রহণ করছে।

আমরা সকলেই অবগত যে, গানের আকর্ষণ তার বাদ্যযন্ত্রে। সে যে গানই হোক না কেন, বাদ্যযন্ত্রকে বাদ দিয়ে গানের মিষ্টতা থাকে না। ঠিক সেইরূপ লোকগানেও নানান লোকবাদ্য ব্যবহার করা হয়। লেটো গানেও অনুরূপভাবে বিভিন্ন লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল, যেমন-হারমোনিয়াম, ডুগি, তবলা, বাঁয়া, ফুলোট বাঁশি, কর্নেট বাঁশি প্রভৃতি কিন্তু বর্তমানে লেটোগানে এসব লৌকিক চিরায়ত বাদ্যযন্ত্রের মূর্চ্ছনা দেখা যায় না, তার পরিবর্তে অত্যাধুনিক উন্নত কারিগরি ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে সেখানে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রের যথা- সিনথেসাইজার, ক্যাসিও, কি-বোর্ড, গিটার, ডিজে প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়। এগুলি ব্যবহারের ফলে একদিকে লেটোপালায় যেমন যন্ত্রের তীব্র দাপাদাপি দেখা যায় তেমনি অন্যদিকে দর্শক মহল সেই তীব্র সুরে ভালোই মেতে ওঠে। লৌকিক বাদ্যযন্ত্রকে ত্যাগ করে মানুষ এগুলিকে সহজেই গ্রহণ করেছে আনন্দ উপভোগের জন্য। যদিও এই যান্ত্রিক সভ্যতায় চির পরিচিত নির্মল লোকবাদ্যগুলি হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের চাওয়া পাওয়াকে কেন্দ্র করে। মানুষ যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছে লৌকিক বিষয়কে এবং হৃদয়ে জায়গা দিচ্ছে নতুন জিনিসকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য-

> *"বিদেশি বলেই ঐসব বিদেশাগত বাদ্যযন্ত্র সর্বথা বর্জনীয়, আমি সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে বলছি না। তবে, যে বিষয় উল্লেখ্য তা হল, বাংলার লোকসঙ্গীতের ভাবব্যঞ্জনা, যে সুর, যে তাল ও লয় তার সাথে মিলিয়েই ছিল ঐ সব বাদ্যযন্ত্র। তার পরিবর্তন সেই সংগীতের যে ব্যঞ্জনা, যে সুরমূর্চ্ছনা তাকেও নিঃসন্দেহে আঘাত করে। বলা বাহুল্য তা করছে। তবে নগরায়নের যে ঢেউ তা আপাতত আসর মাত করছে হয়ত।"* [৫]

এবার আসা যাক লোকশিল্পীদের পোশাক পরিচ্ছদের দিকে। এখন মানুষ এতটাই বিনোদনের জগতে ঢুকে পড়েছে যে, কোনো লেটো পালা উপস্থাপনকালে শিল্পীদের পোশাকে গ্রাম্য, মাটি ঘেঁষা মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় না। বিভিন্ন সিনেমার চরিত্রদের, রাজনীতির নেতা, মন্ত্রীদের চরিত্রের আদলে লেটোশিল্পীরাও নিজেদের সাজিয়ে তুলছে। সেখানে পুরুষদের জিন্স-এর ব্যবহার ও মহিলা শিল্পীদের বিভিন্ন পশ্চিমি পোশাকের ব্যবহার দেখা যায়। গ্রাম্য লৌকিক পোশাক যার উপাদান যদি সেটি বঞ্চিত হয় তাহলে সেই লোকগানের মধ্যে লৌকিক ব্যাপারটা হারিয়ে যায়।মানুষের নজর কাড়ার জন্য উচ্চমানের রঙ-বেরঙের পোশাক ব্যবহার করছেন শিল্পীরা। যা একাধারে মানুষের মন জয় করছে অন্যদিকে দর্শক মনোরঞ্জন করছে।

বর্তমানে লেটো গান বা পালা চলাকালীন শিল্পীদের গানের ভাষা ও কথাবস্তু পাল্টে যাচ্ছে। যদিও পাল্টে যাচ্ছে বলা ভুল, পরিস্থিতির চাপে পড়ে প্রত্যেকটি শিল্পী তাদের কথাবস্তুর ধরণকে বদলে নিচ্ছেন বিশ্বায়নের দুনিয়ায়। প্রায় সময়ই দেখা যাচ্ছে লেটোগানের মাঝে মাঝে হিন্দি গানের দু'একটি লাইনও গাইছে শিল্পীরা। মানুষ এতটাই আধুনিক হয়ে পড়েছে যে, গানের ভাষায় এবং কথাবস্তুতে লাগাম দেওয়ার ব্যাপারে ভেবেও দেখেন না। যে লেটোগান পূর্ববর্তীকালে পরিবারের সকলে মিলে অর্থাৎ বড়োদের সঙ্গে ছোটোদের একসঙ্গে দেখার বা শোনার একটা মজাই আলাদা ছিল, বলাই

বাহুল্য সেই গানের আস্বাদন উপভোগ করার জন্য একটা মার্জিত, সুশৃঙ্খলিত পরিবেশ ছিল। কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বর্তমানে লেটোগানের ভাষায় এমন এমন কিছু অশ্লীল শব্দের প্রয়োগ এবং গানের অর্থ এমন অশ্লীল দাঁড়ায় যা দর্শকের মননে প্রথমেই নাড়া দেয় তা অত্যন্ত কুরুচি। আবার প্রায়শই দেখা যায় লেটো গানের কথায় বা সুরে আদি রসাত্মক রসলাপ সম্বলিত গানও মঞ্চের মধ্যে পরিবেশন করা হচ্ছে। সাধারণভাবে বলা যায় বর্তমান যুব সম্প্রদায়কে মাতিয়ে তোলার এটি একটি উত্তম প্রচেষ্টা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্যযোগ্য মন্তব্যটি হল-

> *"লোকসংস্কৃতির একটি সুর ঝকমকে 'আধুনিক' মোড়কে ভরে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে আবার গ্রামের মানুষকেই ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।"* [৬]

লেটোগান ও পালা উপস্থাপনার জন্য যে মঞ্চ তৈরি হয় সেখানেও পূর্বের তুলনায় তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মঞ্চের চারিদিকে রং-বে রঙের সিল্কের কাপড় দিয়ে বিভিন্ন ডিজাইন করে পর্দাগুলি দেওয়া হয়। মঞ্চের উপরে বিভিন্ন রঙের উন্নতমানের লাইট, হ্যালোজেন, বেশ কয়েকটা মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হচ্ছে। মঞ্চের নীচে একদিকে ইলেকট্রনিক বাদ্যযন্ত্রগুলি সময়মতো চালানোর জন্য দক্ষ শিল্পীরা থাকেন। মঞ্চের অন্যদিকে নীচে থেকে মঞ্চের উপর লাল, নীল, সবুজ, হলুদ লাইট দেওয়ার জন্য অন্য শিল্পীরা থাকেন অর্থাৎ মঞ্চের উপরে শিল্পীদের সংলাপ বলার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রঙের লাইট তাদের মুখে এসে পড়ে। যায় ফলে মঞ্চটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং দর্শক সমাজ আরও মেতে ওঠেন।

বর্তমানে একুশ শতকে নারীরা কোনো অংশে পিছিয়ে নেই, সে যে কোনো চাকরির ক্ষেত্রেই হোক বা কোনো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেই হোক। ঠিক তেমনই লেটোগানেও মহিলা শিল্পীর হিড়িক পড়েছে বর্তমানে, পূর্বেও মহিলা শিল্পীর অংশগ্রহণ ছিল তবে বর্তমানের তুলনায় অনেক কম। পূর্বের লেটোগুলির উপস্থাপনকালে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষ শিল্পীরাই মহিলা সেজে মঞ্চে অভিনয় করত। পুরুষদের মহিলা সেজে মঞ্চে অভিনয়ের মধ্যে ফুটে উঠত এক অন্য রকমের আনন্দ এমনকি হাসির ফোয়ারাও চলত এবং তাতে একটা লৌকিক ছন্দ ফুটে উঠত। কিন্তু বর্তমানে লেটো গানের আসরে প্রচুর মহিলা শিল্পীদের অভিনয় দেখা যাচ্ছে। তাদের বেশভূষা পশ্চিমি সংস্কৃতির আদলে পরিধেয় এবং তাদের অঙ্গসজ্জা যাকে ইংরেজিতে মেকআপ বলে তাতেও লেগেছে নানান বাজারচলতি প্রসাধনীর ব্যবহার কিন্তু পূর্বে লেটোশিল্পীদের অঙ্গসজ্জার জন্য কোনো বাজারচলতি প্রসাধনীর ব্যবহার ছিল না বরং তারা একেবারে গ্রাম্য মানুষদের মতো ভুসো কালি, হলুদ, আলতা, খড়িমাটি ইত্যাদি দিয়ে নিজেদের সাজিয়ে তুলতো। বর্তমানের শিল্পীদের সাজসজ্জায় পশ্চিমি সংস্কৃতির ছোঁয়া লেগেছে দুরদর্শন কর্তৃক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রসাধনীর ব্যবহার দেখে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য-

> *"কেমনভাবে গাইলে বা নাচলে, কি পোশাক পড়লে, মঞ্চকে কিভাবে ব্যবহার করলে তা বিশ্ববাজারের কাছে পণ্যযোগ্য হয়ে উঠবে, তা আগে থেকেই ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। লোকসংস্কৃতির যে ধারাগুলি কথার উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ সেখানে নতুন ধারণা, আলোচনা বিতর্ক নিয়ে আসার অবকাশ আছে এবং লোকশিল্পী যেখানে ভাষার ব্যবহারে সক্রিয় হতে পারেন, সেইসব ধারাগুলি বিশ্বায়নের মঞ্চে অবহেলিত।"* [৭]

অর্থাৎ লেটোশিল্পীরা অত্যধিক আধুনিক হওয়ার দরুন বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে তাদের রচিত পালাগুলি বা গানগুলির উপস্থাপনকালে পাশ্চাত্য মোড়কে ঢেকে দিচ্ছেন এছাড়াও সমসাময়িক কিছু বাজারচলতি ডায়ালগ তারা তাদের পালাতে ব্যবহার করছেন যেমন-খেলা হবে, লক্ষ্মীর ভান্ডার, দুয়ারে সরকার ইত্যাদি। এগুলি ব্যবহার করার ফলে আসরে দর্শক মহলে যুব সম্প্রদায় বেশি মাতোয়ারা হচ্ছে। শিল্পীদের এইসব ব্যবহারের কারণ হিসেবে বলা যায়-

> *"আজকে লোকশিল্পীর লড়াই ভয়ঙ্কর শক্তিশালী প্রযুক্তিভিত্তিক শক্তিগুলির মুখোমুখি হয়ে স্বকীয় আধুনিকতা অর্জন করার লড়াই।"* [৮]

অর্থাৎ শিল্পীদের মধ্যে বর্তমান সমাজে এসে একটি প্রবণতা জন্ম নিয়েছে যেকোনো শিল্পীর অনুষ্ঠান দর্শক মন কাড়তে পারদর্শী। এই ভাবনা থেকেই শিল্পীদের মধ্যে এই পরিবর্তন বা বিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যদিও এসবই তাদের আর্থিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে। বিশ্বায়নের শুরু অর্থকে কেন্দ্র করে হলেও কোথাও গিয়ে সংস্কৃতির মধ্যেও তার অবশিষ্ট এখনো রয়ে গেছে।

পরিশেষে বলা যাই প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন ও আধুনিক সংস্কৃতির প্রসারে বাঙালির কর্মে, শিক্ষায় ও আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। চলমান পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন ঘটাচ্ছে যার জন্য একমাত্র দায়ী সর্বনাশা বিশ্বায়ন। পুঁজিবাদ ও বিশ্ববাজারের অনিবার্য টানে চিরায়ত গ্রামীন সংস্কৃতি, সমাজ আজ সংকটের সম্মুখীন, হারিয়ে ফেলছে তার মূল শিকড়কে। গ্রামীণ লোকসংস্কৃতিতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগার ফলে কৃষিভিত্তিক লোকশিল্পীরা বাঁচার প্রয়োজনে গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হচ্ছে এবং যে শিল্পীরা এই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে তারা সম্পূর্ণভাবে আধুনিকতার বশবর্তী হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাই পূর্বের লেটো শিল্পী যে কয়েকজন এই সংস্কৃতির সঙ্গে এখনো জড়িত তাঁরা আজ লেটো গানের পরিবর্তে পঞ্চরস নামে লেটো গানকে বর্তমান বাজারে প্রচলন ঘটাতে চাইছে। বিশেষ করে লেটো গানের ভাষা, লৌকিক শব্দ, সুর, পোশাক, যন্ত্রপাতি, মঞ্চ, আলোকসজ্জা, শব্দ এবং সর্বোপরি দর্শকদের চাহিদা অর্থাৎ আগেকার দর্শকের সঙ্গে এখনকার দর্শকের রুচির বহুল পরিবর্তন ঘটেছে। এসব বিষয়কে মাথায় রেখে লেটো শিল্পীদের বর্তমান বাজারে টিকে থাকতে হচ্ছে এবং গানগুলির পরিবর্তন ঘটিয়ে আধুনিক করা হচ্ছে। বলাই বাহুল্য বর্তমানে এই বিশ্বায়নের ফলে মানুষের আধুনিক হওয়ার দরুন হাতে স্মার্টফোন ব্যবহারের ফলে ঘরে বসেই বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারছে এমনকি যে সংস্কৃতিগুলি নিজেদের নয় তাদেরকেও গ্রহণ করছে এবং বর্তমানে ইউটিউব এর সাহায্যে লেটো পালাগুলি সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করছে শিল্পীরা। ফলে তাদের পরিচিতি অনেকাংশেই বেড়ে যাচ্ছে এবং তাদের বায়না পেতে অনেক সুবিধা হচ্ছে। এমনকি এর দ্বারা তাদের আর্থিক অবস্থা অনেক সুলভ হচ্ছে। কালের নিয়মে কোনো সংস্কৃতিকেই গন্ডির মধ্যে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়, লোকসংস্কৃতি মূলত মানুষের সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্তনশীল, সেখানে বিশ্বায়ন হয়তো একটা উপাদান হিসেবে কাজ করছে।তাই বিশ্বায়নের দ্বারা যেমন সমস্যা তৈরি হয়েছে তেমনি সমাধানও হয়েছে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে বিশ্বায়নকে সমস্যা তৈরির সহায়ক হিসাবে না ভেবে সমাধানের সহায়ক বলা আমরা স্বাগত জানাবো।

তথ্যসূত্র :

১. এজাজ আহমেদ, সংস্কৃতি ও বিশ্বায়ন, অমিয়কুমার বাগচী সম্পাদিত, বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা (দ্বিতীয় খণ্ড), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃ. ২৬৯
২. শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, লোকসংস্কৃতির ওপর সামাজিক প্রভাব, শতভিষা, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, হাওড়া, জুন, ২০১৯, পৃ. ২৬
৩. তদেব, পৃ. ২৭
৪. অরুণ চৌধুরী, লোকসংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের থাবা, অমিয়কুমার বাগচী সম্পাদিত, বিশ্বায়ন ভাবনা, দুর্ভাবনা (দ্বিতীয় খণ্ড), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃ. ২৯৬
৫. তদেব, ঐ
৬. মালিনী ভট্টাচার্য, বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি, অমিয়কুমার বাগচী সম্পাদিত, বিশ্বায়ন ভাবনা- দুর্ভাবনা (দ্বিতীয় খণ্ড), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃ. ২৯১
৭. তদেব, পৃ. ২৯২
৮. তদেব, ঐ